মুক্তির পথের অ্যারো চিহ্ন কে দেখাবে?

জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে ছোটবেলার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। বলতে পারলে ভালো লাগে। বয়স তখন বারো থেকে চৌদ্দ। গ্রামের বেয়াড়া গোছের বাল্য জীবন। রাখালদের সাথে মাঠে খেলতাম। মা বলতেন, তুই কি রাখাল হবি? বড় হয়ে রাখাল আমি হয়েছি ঠিকই, ছাত্র-ছাত্রী চরাণোর রাখাল। সে-সাথে আমি মানুষ, মানুষের জীবন ও প্রকৃতি এবং এই সমাজকে দু-চোখ ভরে দেখি; এটা আমার রাখালিয়া পর্যবেক্ষণ। বলা যায়, পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা। আব্বার চোখ ফাঁকি দিয়ে রাতে রাতে ধুয়ো-জারি গান শুনতে যেতাম। এক বয়াতি গাইলেন, 'তুমি এ কথা পেলে কোথায়, হলুদ খেলেই রাঙা ছেলে হয়'? কথাটাতে আজো আমার কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। আমি এটা অসম্ভব বলেই জানি। অথচ এদেশের প্রতিটা কাজে আমরা তাই দেখি। মানুষের মতো মানুষ গড়বো না, আবার ত্রুটিযুক্ত, বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ দিয়ে দেশ ও সমাজ চালাবো। তাই যদি হয় দেশটা ভালোভাবে, ভালোপথে চলবে কীভাবে? কথাটা বলছি এই কারণে যে, নির্বাচন একটা হওয়ানো মানেই দেশ গণতন্ত্রে ভরপুর হয়ে যাওয়া নয়। গণতন্ত্রের নতুন সংজ্ঞা দেওয়া এখন এই নব্য-কৌশলী যুগে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সারা দুনিয়ায় একই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ যুতসই নাও হতে পারে। পদ্ধতি গড়ে তোলা উচিত একটা দেশের মানুষের মানসিকতা, জননেতাদের মানসিক অবনতি, জন-শিক্ষার অবস্থা, দেশীয় মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, মননশীলতা ইত্যাদি বিবেচনা করে। আমাদের এ গণতন্ত্রে জনসাধারণ উপেক্ষিত। বিদ্যমান সব দলের ক্ষেত্রেই একই কথা খাটে। রাজনৈতিক জবাবদিহির যে তকমা আমরা চলমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কাছ থেকে পেতে চাই, এ পদ্ধতি তা দিতে পারে না। সেজন্য এ চলমান পদ্ধতি বাস্তবানুগ নয়। তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য; হয়েছেও তাই।

আমি সমাজকে সব সময় অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাই। যে দিকে তাকায় 'জোর যার মুল্লুক তার' ভাব। পেশিশক্তিধারীদের দৌরাত্ম্য, চোরের মা-র বড়ো গলা, ডাহা মিথ্যাবাদির জয়-জয়াকার; সমাজে যারা ধোপদুরস্ত কাপড় পরে চলাফেরা করে, তাদের অনেকেরই মুখের কথার কোনো মূল্য নেই, অন্তরটা কর্দমাক্ত, মনুষ্যত্বেরও বড় অভাব। এমন কি কোথাও স্বাক্ষর করে কোনো কথাকে স্বীকার করে নিলেও অল্প সময় অতিক্রমণে বিভিন্ন অজুহাতে ভোল পালটে তা অস্বীকার করে। বিবেকের কোনো দংশন না থাকলে এমনটিই হয়। আবার বিবেকের দংশন না থাকলে তাদের মানুষও বলা যায় না। পশুত্ব প্রাধান্য পায়। বর্তমান সমাজের দিকে কেউ যদি নির্মোহ হয়ে তাকায়, আমরা কি দেখবো? মিথ্যা বলা বা প্রচার করার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। বিবেক ও লজ্জার বালাই নেই। প্রতারণার প্রকাশ্য দাপট বাঁধ ভেঙে সমস্ত সত্যকে মিথ্যার প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি না; ভাবছি রাজনীতি নিয়ে, রাজনীতিকে মুখের কথায় ভালো করার সস্তা দাওয়াই নিয়ে। যদিও লালন গেয়েছেন, 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা? বেদে নাই যার রূপরেখা ওরে...'। দুর্নীতি করে তিন বার কান-কাটা লোক রাস্তার মাঝ বরাবর বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মনে হয়, সে যেন বড় একটা কৃতিত্বের কাজ করেছে। সাধারণ মানুষকে নির্বোধ ভাবে। অথচ সে নিজেই বড় নির্বোধ। অগণিত সোস্যাল টাউটরা রাজনীতিতে ঢুকেছে। পুরো সমাজটাই চলে গেছে মুখোশধারীদের দখলে। তাই রাজনীতি পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। রাজনীতিক ও তাদের দোসররা কথা বলে মৌসুমী ভাষায়, বাতাস বুঝে, স্বার্থ উদ্ধারে, যা তাদের মনের কথা নয়। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা মতিভ্রম ঘটে। কথার ওপর নির্ভর করা যায় না। সময় ফুরালেই সব কথা বাতাসে হারিয়ে যায়। মুখের কথা ও মনের মধ্যে পুষে রাখা গোপন উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'মুখে মধু, পেটে বিষ'। কথা

সবাই দেয়, কথা অনেকেই রাখে না। সমাজে মেকির ছড়াছড়ি। মিথ্যার বেসাতি। সত্যবাদিদের বড় দুর্দিন। সত্য কথন ও সত্যের প্রতি অবিচল আস্থার দিন ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। সমাজ থেকে সত্য প্রায়ই অপসৃত। এ নিয়ে আমরা কথায় কথায় রাজনীতিকে দোষারোপ করি। এ দোষারোপ মানায় না, সর্বাংশে সত্য নয়, হেতু আছে। আসলে সমাজ পরিচালনায় ব্যস্ত মানুষের মনুষ্যত্বের যত গুণ, সেগুলো লোপ পেয়েছে। এরা মানুষ না, মানুষ নামের ধূর্ত-প্রতারক। এরা মানুষ নামের কলঙ্ক। এদের বোধশক্তি হারিয়ে গেছে, মনুষ্যত্বের গুণ বিলীন হয়ে গেছে; যদিও ডাকছি মানুষ নামে। সমাজের মানুষগুলো যতটা পারা যায় ভালো করে মনুষ্যত্বসম্পন্ন-বোধের আদলে গড়তে পারলে, এদের রাজনীতিতে আনতে পারলে রাজনীতি আবার ভালো হয়ে যাবে। সমাজে আবার শান্তি ফিরে আসবে। রাজনীতিতে ইদানীং ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের লোক আসতে চায় না, তো রাজনীতি ভালো হবে কী করে? সমাজ পরিচালনায় চরিত্রবান লোকের পদচারণা নেই বললেই চলে।

আমরা ময়লা-আবর্জনা থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ আশা করি। এটা অবাস্তব। সুগন্ধিযুক্ত ঘ্রাণ পেতে গেলে এদেশে গুণসম্পন্ন ফুলের চাষ শুরু করতে হবে। এছাড়া ভিন্ন কোনো পথ আমার জানা নাই। এই ভালো বানানোর প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা। এছাড়া 'রাজনীতি ও প্রশাসনিক কন্ট্রোল সিস্টেম' এবং প্রতিটা পর্যায়ে 'ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম' চালু করা। কন্ট্রোল সিস্টেম ছাড়া জাহাজকে নির্বিঘ্নে বাঞ্ছিত ঘাটে ভেড়ানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বর্তমান উন্নত টেকনোলজির যুগে মানুষ যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চষে বেড়াচ্ছে, সুষ্ঠু কন্ট্রোলিং সিস্টেম তৈরি ও এর বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয়। অথচ এতে আমাদের বড়ই আপত্তি। ইচ্ছে থাকলে সবকিছুই সম্ভব। এখনই শুরু না করলে পরিণতি আরো খারাপ হবে। আমাদের ব্যামো হচ্ছে রোগীকে রোগের প্রেসক্রিপশন করতে দিই। এতে রোগীর বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়ে। ডাক্তারকে রোগীরা ভয় পায়। এজন্য বিভিন্ন অজুহাতে, রোগীর পরামর্শে ডাক্তারকে দূরে রাখি। পেশাব দিয়ে বেশি করে ধুয়ে-মুছে জায়গাকে পূতঃপবিত্র করতে বদ্ধপরিকর হই। সবকিছুই অরোণ্যে রোদন হওয়া বৈ আর কিছু নয়।

এদেশের ঘাপটি মেরে থাকা ভিত্তিহীন ও মনুষ্যত্বহীন ভোগবাদে নিমজ্জিত জোট কোনোভাবেই মানবিক গুণ-সঞ্চারক শিক্ষা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হোক, চায় না। ন্যায়নিষ্ঠার চর্চাও তারা করে না। তারা চায়,' খাও-দাও ফূর্তি কর, আগামীকাল বাঁচবে কি-না বলতে পারো, হেই দুনিয়াটা মস্ত বড়...'। তারা চায়, পানি ঘোলা করে দেশ ও মানুষ শোষণের পরিবেশ তৈরি করতে। তারা চায়, দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে পরদেশী সংস্কৃতি ও মতবাদ এদেশে চালু করতে; নিজেদের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিতে; এদেশকে ভিনদেশি গোলামে পরিণত করতে। এদেশ ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসা অতটা সহজ নয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট। এদেশের রাজনীতি এই থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের হাতের পুতুল। তাই দলমত নির্বিশেষে সাধারণ সুশিক্ষিত দেশ-সচেতন মানুষকে জেগে উঠতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তবে আমরা রোগীকে প্রেসক্রিপশনের দায়িত্ব কোনোভাবেই দেব না, এটাই হবে আমাদের প্রতিজ্ঞা। প্রয়োজনীয় আইনের সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজনে জনগণের রায়ে সংবিধানও সংশোধন করা লাগতে পারে। জীবন বাঁচাতে প্রয়োজনে কোনো না কোনো অঙ্গচ্ছেদনও করতে হতে পারে।

আমরা প্রথম চেয়েছিলাম ব্রিটিশ শোষণ থেকে দেশ বাঁচাতে। তারপর চেয়েছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে, তাদের গোঁয়ার্তুমি কর্মকাণ্ডের কারণে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার উদ্দেশ্য আমরা ভুলতে বসেছি। আমরা খুব আত্মবিস্মৃত জাতি। এখন 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভুত বলে পেলাম কাছে' অবস্থা। এখন আমরাই আমাদের শোষক। মাঝখান থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও আত্ম-অহংবোধ। পরিশেষে পেলাম 'মানব-আপদ' নামে বৃহৎ জনগোষ্ঠী, যদিও এদের 'মানব-সম্পদ' হবার কথা ছিল। এখন সম্বল আমাদের পাশের গ্রামের পাগলা রহমের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানো সেই গানের উক্তি, 'আমি যা চেলাম তা পেলাম কই, তুমি ক্যানো মজালে সই বাজারে এনে'। এসবকিছুর জন্য অপরিণামদর্শী ও সুযোগসন্ধানী বিকৃতমনা-মতলববাজ রাজনীতিকরাই দায়ী। যে দলই নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতা ভাবুক না কেন, এ দায় কোনো রাজনৈতিক দলই এড়িয়ে যেতে পারে না। আমরা এখন আর সামষ্টিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো কাজে আনন্দ পাই না; সামষ্টিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেও কৌশলে ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থের পরিবেশ তৈরিতে মত্ত হয়ে পড়ি। সব কৌশল 'ওপেন-সিক্রেট' হয়ে গেছে। এসব আমাদের নব্য সমাজদর্শন। আমরা মানি আর না মানি কঠিন বাস্তবতাকে তো কেউ অস্বীকার করতে পারি না। তাও কেউ কেউ অমূলক তর্ক শুরু করে দেয়। জীবনসায়াহ্নে এসে এখন এটাই বড় চিন্তা। আমাদের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! কোথা থেকে তারা সুশিক্ষা পাবে! মানুষের মতো মানুষ হবে! ফিলিস্তিন ও রহিঙ্গাদের বাস্তব অবস্থা দেখলে ভয়ে প্রাণটা ধপ করে কেঁপে ওঠে।

এদেশের রাজনীতি নিয়ে আমার এক পরলোকগত জ্ঞানজ্যেষ্ঠ সহকর্মী অধ্যাপক ড. এম. এইচ. রহমান (মার্কেটিং বিভাগ, ঢা.বি.) একটা গল্প বলেছিলেন, সেটা আজ বড্ড মনে পড়ছে। গল্পটা এমন: একদিন সকালে সদ্য বিবাহিত এক মেয়ে স্বামীর সাথে রাত কাটিয়ে ঘুম থেকে উঠেই হাসি হাসি মুখে মাকে বলছে, 'মা, তোমাদের নতুন জামাই আজ রাইতে কইছে, আমাদের সংসারে দুঃখ-কষ্ট আর কিছুই থাকবো না। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সবই সে সমাধান কইরা দেবে'। নতুন জামাইয়ের দেওয়া কথাটা বলতে পেরে মেয়ে খুব উৎফুল্ল। মাকে উত্তরে কিছু না বলতে দেখে মেয়ে বললো,'মা তুমি কি চাওনা আমাদের সংসার সচ্ছল হয়ে উঠুক'? মা এবার মুখ খুললেন। বললেন, 'হ্যাঁ মা, জামাই কি তোকে পেরথম রাইতে কথা দিছিল, নাকি শেষ রাইতে কথা দিছিল'? মেয়ে বললো, কেন মা'? মা বললেন,'তোর বাবাও আমারে পেরথম রাইতে অনেক কথা দিছিল। পেরথম রাইতে সবাই কথা দেয়, শেষ রাইতে কেউ কথা দেয় না। সকাল হইলে হগলেই ভুইলা যায়'। আমাদের রাজনীতিকদের অবস্থাও তাই। কর্ম উদ্ধারের জন্য সবাই 'পেরথম রাইতে' অনেক কথা দেয়। সকাল হতে না হতেই মুখসর্বস্ব কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় মশগুল হয়ে পড়ে।

(২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ